ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 186-193
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.448

বর্তমানে অতীত: সমকালীন ভারতে আদিবাসী বাস্তুচ্যুতি ও প্রতিরোধের ঔপনিবেশিক শিকড়

মহ: আজাহারউদ্দিন, *সহকারী শিক্ষক, পার্বতীপুর জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.04.2026; Accepted: 08.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The research paper investigates how present-day tribal dislocation in India stems from historical events by examining the connections between colonial forest management practices and present-day development frameworks. The study demonstrates that current tribal community displacements represent a continuation of colonial practices that controlled indigenous territories and natural resources and native cultural heritage. The British Raj period established forest regulations that changed tribal people from landowners into state-defined subjects. The systems that excluded people from society continued to operate after independence through their implementation in state-backed development activities, mining operations, and environmental protection initiatives. The research study uses Michel Foucault's and Ranajit Guha's theoretical frameworks to study how power operates in both colonial and modern institutional environments. In my recharge various types of tribal movement including like santhal rebellion, mundari billion and other trivial movement. My Recharge also prove that that time travel continuously strikes with time and their mole achievement and m was land reform cultural identification and their society position. This paper also mentions that how in the period of ancient to modern various movement partially incident. Conclusion of this paper the tribal people must displacement in India as a part of an they are social and cultural benefits rather than a series of violet and isolated position.

Keywords: Tribal Displacement, Colonial Forest Policies, Indigenous Land Rights, Development-Induced Displacement, Tribal Resistance Movements

আদিবাসী জনগোষ্ঠী— যারা ভারতের বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে— তারা হলো এই জাতির প্রাচীনতম আদিম অধিবাসী। এই মানুষগুলো ভূমি, অরণ্য এবং প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে তাদের গভীর সংযোগ বজায় রাখে; কারণ তারা এই সম্পদগুলোকে কেবল অর্থনৈতিক উৎস হিসেবেই নয়, বরং তাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেও গণ্য করে। বাইরের ক্ষমতাধর শক্তিগুলো প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সাথে তাদের এই বন্ধনে ব্যাঘাত ঘটিয়ে চলেছে। বর্তমানে খনি খনন কার্যক্রম, শিল্পায়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণমূলক বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে অনেক উপজাতীয় গোষ্ঠীকে তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হতে হচ্ছে। আধুনিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তার নিজস্ব কার্যক্রমকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে

এই সমস্যাগুলোকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এই গবেষণাপত্রটি তুলে ধরে যে, অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলিই বর্তমানের বিদ্যমান সমস্যাগুলোর ভিত্তি রচনা করেছে। এই গবেষণাপত্রের মূল প্রতিপাদ্য হলো— ভারতে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বর্তমান বাস্তুচ্যুতি কোনো নতুন সংকট নয়, বরং এটি ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারই একটি ধারাবাহিকতা মাত্র। ব্রিটিশ শাসনকালে এমন কিছু আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে অরণ্য এলাকা এবং ভূখণ্ডের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ওই আইনগুলো অরণ্য এলাকার ওপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং একই সাথে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর প্রথাগত ভূমি অধিকারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিল। ওই আইনগুলোর জেরে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলো তাদের নিজস্ব ভূখণ্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং তাদের সাথে এমন আচরণ করা হতো, যেন তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো জাতির মানুষ। সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। পরবর্তীকালে প্রণীত বিভিন্ন নীতি ও উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলো এই ব্যবস্থাগুলোর রূপান্তর ঘটিয়েছে। রাষ্ট্র ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর তার কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে, অথচ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছে। প্রাপ্ত প্রমাণাদি থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ক্ষমতার কাঠামোটি ইতিহাসের পরিক্রমায় তার মৌলিক রূপ বা নকশাটি অপরিবর্তিতই রেখেছে। এই গবেষণাপত্রটি নিম্নোক্ত প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াস পায়:

অরণ্য নিয়ন্ত্রণের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাগুলো কীভাবে ভারতে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বর্তমান বাস্তুচ্যুতি এবং তাদের প্রতিরোধ আন্দোলনকে প্রভাবিত ও রূপদান করে চলেছে?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার লক্ষ্যে, গবেষণাপত্রটি ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক— উভয় প্রেক্ষাপটকেই বিশদভাবে বিশ্লেষণ করবে। পাশাপাশি, আমরা উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধ আন্দোলনের ক্রমবিকাশের বিষয়টিও খতিয়ে দেখব। এর মাধ্যমে গবেষণাপত্রটি এটিই তুলে ধরতে চায় যে, অতীত কীভাবে আজও উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোর জীবনযাত্রার ওপর তার প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

নৃবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন হলো এমন কয়েকটি অ্যাকাডেমিক শাখা যেখানে ভারতীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধ্যয়ন প্রসারিত হয়েছে। যেহেতু এই দুটির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ নেই, তাই বেশিরভাগ গবেষণাই হয় ঔপনিবেশিক অতীত অথবা বর্তমান বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করে। ঐতিহাসিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ঔপনিবেশিক শাসনকালে সরকারি পদক্ষেপ এবং বন আইনকানুন কীভাবে আদিবাসী সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছিল। এই গবেষণাটি দেখায় যে কীভাবে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার কাঠামো আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিকে অধীনস্থ শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করত এবং প্রাকৃতিক বনভূমিকে আর্থিক সম্পদে পরিণত করত। রণজিৎ গুহ এবং সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। লেখকের মতে, প্রচলিত ঐতিহাসিক আখ্যানগুলি অধস্তন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসনকে উপেক্ষা করে। আজকাল, গবেষকরা অগ্রগতি, পরিবেশ সুরক্ষা অধিকার এবং স্থানচ্যুতির মতো বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা করেন। গবেষণাটি দাবি করে যে ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি ক্রমাগত সামাজিক প্রান্তিকতার সম্মুখীন হচ্ছে (শাবন ও শর্মা, ২০০৭)। গবেষণা অনুসারে, শহরাঞ্চল এবং শিল্প উন্নয়নকে সমর্থনকারী উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে (সেঠি, ১৯৮৮)। বর্তমানে অ্যাকাডেমিক সাহিত্যে একটি গবেষণার শূন্যতা রয়েছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা এবং আধুনিক বাস্তুচ্যুতির মধ্যেকার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুব বেশি মনোযোগ পায়নি। উভয় ঐতিহাসিক সময়কাল পর্যালোচনা করা সত্ত্বেও, গবেষকরা সেগুলোকে চলমান ক্ষমতার কাঠামো হিসেবে দেখেন না। এই গবেষণাটি এই গবেষণার

শূন্যতা পূরণের জন্য ঐতিহাসিক এবং বর্তমান গবেষণার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো বর্তমানে এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যা ঔপনিবেশিক সময় থেকে চলে আসছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো:

এই গবেষণাপত্রটি দুটি তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে আদিবাসী বাস্তুচ্যুতি এবং প্রতিরোধের বিষয়টি অনুসন্ধান করে, যার মধ্যে ক্ষমতা তত্ত্ব এবং সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এই গবেষণাটি তার মৌলিক নীতি হিসেবে মিশেল ফুকোর ক্ষমতার ধারণার উপর নির্ভর করে। ফুকোর মতে, ক্ষমতা দুটি রূপে বিদ্যমান, যার মধ্যে রয়েছে প্রত্যক্ষ শারীরিক নিয়ন্ত্রণ এবং জ্ঞান ব্যবস্থা, আইনি কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ (ফুকো, ১৯৮২)। ঔপনিবেশিক সময়ে বন আইন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলো এমন কৌশল হিসেবে কাজ করত যা উপনিবেশকারীদের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে সক্ষম করেছিল। এই ব্যবস্থাগুলো আইনসম্মত ও বেআইনি উভয় কার্যকলাপের মানদণ্ড স্থাপন করেছিল এবং কারা জমি ও সম্পদ ব্যবহার করার জন্য অনুমোদিত তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। এই ধারণাটি ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে উপনিবেশবাদ বনজ সম্পদের উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং কীভাবে এই ক্ষমতার কাঠামো আজও কার্যকর রয়েছে। সংরক্ষণ আইন এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলো আধুনিক ক্ষমতা প্রয়োগের কৌশল হিসেবে কাজ করে, যা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ দ্বিতীয় তাত্ত্বিক কাঠামোটি প্রদান করে, যা রণজিৎ গুহার অ্যাকাডেমিক অবদান থেকে অনুপ্রাণিত। সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ ক্ষেত্রটি অনুসন্ধান করে যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কীভাবে জীবনযাপন করে যখন তারা প্রচলিত ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চনার শিকার হয়। গুহার দ্বারা অধ্যয়নকৃত গোষ্ঠীটির নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে, যা প্রধান ঐতিহাসিক আখ্যানের বাইরে বিদ্যমান (ওয়েলস, ১৯৮৫)। এই কাঠামোটি এমন একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে যা গবেষকদেরকে ইতিহাস জুড়ে সংঘটিত এবং আধুনিক সময়েও বিদ্যমান উপজাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো অধ্যয়ন করতে সক্ষম করে। এই কাঠামোটি আমাদেরকে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোকে কেবল ভুক্তভোগী হিসেবে না দেখে, তার চেয়েও বেশি কিছু হিসেবে বুঝতে সাহায্য করে, কারণ তারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা কাঠামোকে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করে। এই গবেষণাপত্রটি দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষমতা কাঠামো অনুসন্ধান করে, যা উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলো কীভাবে তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখে তাও দেখায়।

পদ্ধতি:

গবেষণাটি তার অনুসন্ধানের জন্য একটি গুণগত ও ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে। গবেষণাটি সংখ্যাসূচক তথ্য ব্যবহারের পরিবর্তে পাঠ্য বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিক নথিপত্র পরীক্ষা এবং কেস স্টাডি গবেষণার উপর আলোকপাত করে। এই গবেষণায় ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতির পাশাপাশি বর্তমান কেস স্টাডি পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয়েছে। গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ঔপনিবেশিক বন আইন ও নীতির ভূমিকা নির্ধারণের জন্য সেগুলোর অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় ধাপে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব ফেলে এমন সমসাময়িক উন্নয়ন উদ্যোগ ও নীতিসমূহ পরীক্ষা করা প্রয়োজন। গবেষণাটিতে আদিবাসী প্রতিরোধ আন্দোলনের উপর আলোকপাতকারী কেস স্টাডি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং মুন্ডা বিদ্রোহকে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা গবেষকরা আধুনিক উচ্ছেদ আন্দোলনের সাথে তুলনা করার জন্য বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষণায় ব্যবহৃত প্রাথমিক উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে ঔপনিবেশিক নথি, সরকারি প্রতিবেদন এবং আইনি পাঠ্য। গবেষণাটি মাধ্যমিক উৎস হিসেবে অ্যাকাডেমিক বই, জার্নাল নিবন্ধ এবং সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ব্যবহার করে। গবেষণাটি তার বিশ্লেষণের জন্য ফুকো এবং সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ পণ্ডিতদের তাত্ত্বিক পাঠ্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। গবেষকরা উভয় ব্যবস্থা অধ্যয়নের জন্য সমালোচনামূলক এবং

তুলনামূলক বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছেন। গবেষণাটি ঔপনিবেশিক সময়ে ব্যবহৃত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাথে সমসাময়িক সমাজে ব্যবহৃত পদ্ধতির তুলনা ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরে। গবেষণাটি অনুসন্ধান করে যে কীভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়কালে প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো রূপান্তরিত হয়েছে। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হলো ক্ষমতার গতিশীলতা এবং ঐতিহাসিক বিকাশের সাথে সংযোগের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে উন্মোচন করা।

ঔপনিবেশিক বন আইন এবং আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুত:

ব্রিটিশ রাজের নীতিগুলোই ভারতে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর তাদের আদি বাসস্থান হারানোর প্রধান কারণগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিল। ঔপনিবেশিক শক্তি আসার আগে, আদিবাসীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী প্রথা অনুসারে বনভূমিতে বসবাস করত, যা যৌথ ভূমি মালিকানাকে স্বীকৃতি দিত। মানুষ ভূমিকে একটি যৌথ সম্পদ হিসেবে দেখত, যা তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং মৌলিক চাহিদার সাথে সংযুক্ত ছিল। ব্রিটিশরা আনুষ্ঠানিক বন আইন নিয়ে আসে, যা বিদ্যমান ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত করে (গুহা, ১৯৮৩)। ১৮৬৫ সালের ভারতীয় বন আইন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিল, যার পরে বেশ কিছু সংশোধনী আনা হয়। এই আইনগুলো বনের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে এবং একই সাথে আদিবাসীদের এই এলাকাগুলোতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। রাষ্ট্র নির্দিষ্ট নিয়মকানুন তৈরি করে, যা শিকার, পশুচারণ এবং বনজ সম্পদ সংগ্রহসহ সমস্ত কার্যকলাপকে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত অবৈধ করে তোলে। এই পরিবর্তন নতুন আইনি কাঠামো তৈরি করে, যা প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসে পরিবর্তন নিয়ে আসে। বনভূমির অর্থনৈতিক শোষণ, সম্প্রদায়ের বসবাসের স্থান হিসেবে এর পূর্ববর্তী ভূমিকাকে প্রতিস্থাপন করে। রেলপথ নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ এবং শিল্প প্রসারের জন্য কাঠ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলো তাদের পৈতৃক ভূমিতে শ্রমিক হয়ে পড়ায়, নিজেদের অঞ্চল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাদের হাত থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফুকোর তত্ত্ব দেখায় যে, এই পরিস্থিতি এক ধরণের কর্তৃত্ব হিসেবে কাজ করে, যা মানুষকে শৃঙ্খলিত করে। রাষ্ট্র তার আইনি কাঠামো, ভূমি জরিপ প্রক্রিয়া এবং সরকারি প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে ভূমি ও জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল (গুহ ও গাদগিল, ১৯৮৯)। ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানগুলো বনভূমি সম্পর্কে এমন এক ধরণের জ্ঞান গড়ে তুলেছিল, যা এই এলাকাগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক প্রমাণিত হয়েছিল। ক্ষমতা মূলত দুটি প্রধান পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রিয়াশীল থাকে; এর মধ্যে রয়েছে বলপ্রয়োগ এবং শ্রেণিবিন্যাস ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই আইনগুলো অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও কঠোর পরিণাম ডেকে এনেছিল। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো তাদের স্বাধীন মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিল, যার ফলে তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বলয়ে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিল। আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যরা যখন মজুরি-ভিত্তিক কাজের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন তারা তাদের স্বকীয় স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে; অন্যদিকে, তাদেরই কেউ কেউ অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনশীল এলাকাগুলোতে পাড়ি জমায়। এই সময়কালে আদিবাসীদের মধ্যে যে চরম অসহায়ত্ব ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তা আজও তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে।

সমসাময়িক উন্নয়ন এবং বাস্তুচ্যুতি:

এমন প্রত্যাশা ছিল যে, স্বাধীনতা লাভের পর ভারত ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের অবশিষ্ট সকল ব্যবস্থা বিলুপ্ত করবে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটলেও, প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলো পূর্বের পদ্ধতিতেই চলতে থাকে। রাষ্ট্র বনভূমিগুলোর ওপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখে, যা আদিবাসী অধিবাসীদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে খনি খনন কার্যক্রম, বাঁধ নির্মাণ, শিল্প উন্নয়ন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উদ্যোগের কারণে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো তাদের পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের শিকার হচ্ছে (ফার্নান্দেস, ২০০৭)। সরকার এই প্রকল্পগুলোকে জাতীয় অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য হিসেবে উপস্থাপন করলেও, তারা

প্রায়শই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার ও প্রয়োজনীয়তাগুলোকে উপেক্ষা করে। মধ্য ভারতের অঞ্চলগুলোতে খনি খনন কার্যক্রমের ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি ঘটেছে। ব্যাঘ্র সংরক্ষণাগার স্থাপনের ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের বনভূমি-বেষ্টিত আবাসস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এই জনগোষ্ঠীগুলো ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য আর্থিক অনুদান ও সহায়তা পেলেও, সেই সহায়তা তাদের হারানো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। বনভূমির ওপর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে ঐতিহাসিক অবিচার সংশোধনের লক্ষ্যে 'বন অধিকার আইন' (Forest Rights Act) প্রবর্তন করা হয়েছিল। তবে এই ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সরকার অসংখ্য দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোকে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করছে। বর্তমান ব্যবস্থাটির সাথে ঔপনিবেশিক শাসনপদ্ধতির প্রত্যক্ষ সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। উন্নয়ন ব্যবস্থাটি তার পূর্বের কাঠামোই বজায় রেখেছে; কারণ ঔপনিবেশিক আমল থেকে ক্ষমতার বণ্টন ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। ভূমি ব্যবহারের অধিকার নির্ধারণের পূর্ণ কর্তৃত্ব সরকারের হাতেই ন্যস্ত রয়েছে এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়েই সরকার সেই কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে থাকে (চৌধুরী, ২০১২)। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের বর্তমান সভ্যতা আজও এমন এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে, যাকে আমরা 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশায়ন' (internal colonization) হিসেবে অভিহিত করতে পারি। ভারত সরকার বর্তমানে এমন একটি সত্তা হিসেবে কাজ করছে, যারা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর ওপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং সেগুলোর সম্পদ শোষণ করে— যে অঞ্চলগুলো পূর্বে বিদেশি শক্তির নিয়ন্ত্রণে ছিল।

আদিবাসী প্রতিরোধের ধারাবাহিকতা:

যেসব ব্যবস্থা মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াও বিদ্যমান থাকে; তথাপি মানুষ সেই কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ঔপনিবেশিক এবং আধুনিক— উভয় প্রকার আধিপত্যের বিরুদ্ধেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা যেসব আধিপত্যবাদী শক্তির সম্মুখীন হয়েছে, তাদের সকলের বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো তাদের ঐতিহাসিক স্বকীয়তা ও পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং মুন্ডা বিদ্রোহ— সেই সময়ে আদিবাসী অভ্যুত্থানের সূচনা ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। বিরসা মুন্ডা এবং অন্যান্য নেতা স্থানীয় জনগণকে সংগঠিত করে সেইসব শোষক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন, যাদের মধ্যে জমিদার, মহাজন এবং ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী অন্যতম। এই আন্দোলনগুলো মূলত অর্থনৈতিক সংঘাত হিসেবেই কাজ করত, অথচ মানুষ সেগুলোকে নিজেদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করত। তারা একদিকে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন করার অধিকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তেমনি অন্যদিকে নিজেদের প্রথাগত জীবনধারাকে রক্ষা করেছে। ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায় বর্তমানে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে বিভিন্ন পন্থায় অব্যাহত রেখেছে। এই চলমান প্রতিরোধ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়; যার মধ্যে রয়েছে খনি প্রকল্পগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ভূমির অধিকার বিষয়ক আন্দোলন এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অভিযান। নিজেদের বার্তা প্রচারের লক্ষ্যে এই আন্দোলনগুলো আইনি ব্যবস্থা, বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং আন্দোলনকর্মীদের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগায়। অতীতের প্রতিরোধ সংগ্রামের পদ্ধতির সাথে তুলনা করলে, বর্তমানে মানুষ যেভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে— তাতে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে এমন সব ঔপনিবেশিক বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়েছিল, যেখানে

প্রকাশ্য সহিংসতার আশ্রয় নেওয়া হতো; কিন্তু বর্তমানের আধুনিক আন্দোলনগুলো সুপরিকল্পিত ও পদ্ধতিগতভাবে পরিচালিত হয়। এই আন্দোলনগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো বিভিন্ন অংশীজনের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলে; যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্দোলনকর্মী এবং আইনি সহায়তা প্রদানকারী সংগঠনসমূহ। এই সংঘাতের মূল বিষয়বস্তুটি অবশ্য অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে; কারণ মানুষ আজও তাদের ভূমি, নিজস্ব সত্তা বা পরিচয় এবং স্বশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিদ্যমান আদিবাসী প্রতিরোধ সংগ্রামটি এ কথাই প্রমাণ করে যে, মানুষ মূলত কাঠামোগত অবিচারের বিরুদ্ধেই লড়াই করে—কারণ তারা দীর্ঘকাল ধরে ক্রমাগত নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছে। 'সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ' (Subaltern Studies)-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো কীভাবে এই আন্দোলনগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের শক্তি ও অবস্থান বজায় রাখে। এই আন্দোলনগুলোর সাথে যুক্ত মানুষজন— ইতিহাসের সক্রিয় অংশীদার হিসেবে— নিজেদের ইতিহাসের আখ্যান বা বয়ানকে নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বিশ্লেষণ: ক্ষমতা কাঠামোর ধারাবাহিকতা:

ঔপনিবেশিক এবং আধুনিক উভয় প্রেক্ষাপট পরীক্ষা করলে একটি সুসংগত ধরন প্রকাশ পায়। ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো নতুন রূপে বিকশিত হয়েছে যা আজও বিদ্যমান। প্রথম বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করে যে, বনের উপর রাষ্ট্রের মালিকানাই প্রধান কর্তৃত্ব হিসেবে রয়ে গেছে। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোকে সম্পদ ব্যবহারের জন্য অনুমতি নিতে হয়, যা তারা আগে কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই ব্যবহার করত। ঔপনিবেশিক যুগে যে যুক্তির সূচনা হয়েছিল, তা আজও কার্যকর রয়েছে। সম্পদ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের মূল কাজগুলো অক্ষুণ্ণ রয়েছে। উপনিবেশকারীরা তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সময় বনজ সম্পদ ব্যবহার করত। বর্তমান ব্যবস্থা উন্নয়নমূলক এবং সুরক্ষামূলক উভয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনা করে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনগুলো অন্যান্য চাহিদার তুলনায় কম অগ্রাধিকার পায়। চলমান এই ধরনটি দেখায় যে, আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চনার শিকার হয়। এই অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠী এমন বাধার সম্মুখীন হয় যা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রকৃত অবদান রাখতে বাধা দেয়। এই ব্যবস্থাটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বঞ্চনাকে ব্যবহার করে। ফুকোর ক্ষমতার ধারণাটি দেখায় যে প্রতিষ্ঠান, আইনি কাঠামো এবং জ্ঞান ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। ক্ষমতা কর্তৃত্ব বজায় রাখার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে এবং একই সাথে এটি সামাজিক রীতিনীতি ও গ্রহণযোগ্য আচরণ নির্ধারণ করে। গুহার তত্ত্বগুলো ব্যাখ্যা করে কেন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো মূলধারার সমাজ থেকে পদ্ধতিগত বর্জনের শিকার হয়। অধস্তন গোষ্ঠীগুলো প্রান্তিকীকরণের শিকার হয় কারণ মূলধারার বয়ানগুলো রাষ্ট্র ও অভিজাতদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দেয়। গবেষণাটি দেখায় যে আধুনিক সময়ে আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুতি একটি বৃহত্তর ধারার অংশ হিসেবে বিদ্যমান, যা ইতিহাস জুড়ে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোকে প্রভাবিত করেছে। এই ঐতিহাসিক কাঠামো এখনও আদিবাসী সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে।

উপসংহার:

আমার পরিচালিত গবেষণাটি প্রমাণ করেছে যে বর্তমান ভারতে আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুতির উৎস ঔপনিবেশিক যুগে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে উদ্ভূত। গবেষণাটি দেখিয়েছে যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের শাসনামলে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেগুলো আজকের সরকারি কার্যক্রম এবং ব্যক্তিগত কার্যকলাপের ওপর তাদের প্রভাব বজায় রেখেছে। ঔপনিবেশিক বন আইন প্রতিষ্ঠা আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য একটি নতুন মর্যাদা তৈরি করেছিল, যা তাদের স্বনির্ভর বাসিন্দা থেকে সামাজিক বঞ্চনার শিকার মানুষে পরিণত করে। এই

ব্যবস্থাগুলো অক্ষত ছিল কারণ স্বাধীনতার পরেও এগুলো তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচি ও পরিবেশ সুরক্ষা উদ্যোগের বাস্তবায়ন এবং সেইসাথে আঞ্চলিক সম্পদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই ব্যবস্থাগুলো কার্যকর ছিল। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো ইতিহাস জুড়ে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা হিসেবে তাদের প্রতিরোধ বজায় রেখেছে। উনিশ শতকের বিদ্রোহ থেকে শুরু করে সমসাময়িক প্রতিবাদ পর্যন্ত, আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তাদের প্রতিরোধ প্রমাণ করে যে, তারা টিকে থাকার ক্ষমতা বজায় রেখেও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। এই গবেষণাপত্রটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বর্তমান গবেষণার ফলাফলের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করে। বর্তমান বিষয়গুলোর ঐতিহাসিক অধ্যয়ন প্রয়োজন, কারণ এদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট না বুঝলে এগুলোকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এই গবেষণা পদ্ধতিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার শূন্যতা চিহ্নিত করে, যা পূরণ করা প্রয়োজন। ভারতে চলমান ক্ষমতার কাঠামোই আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুতির প্রকৃত কারণ হিসেবে কাজ করে, এবং এটিকে একটি বিদ্যমান সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ন্যায়সঙ্গত নীতি প্রণয়নের জন্য ইতিহাস জুড়ে ক্ষমতার কাঠামোগুলো কীভাবে টিকে আছে, তা বোঝা আবশ্যক। এই প্রক্রিয়ার জন্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ও অধিকারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, যাদেরকে প্রভাবশালী ঐতিহাসিক বিবরণগুলোতে দৃশ্যমানতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। গুহ, রামচন্দ্র ও গাডগিল, মাধব। (১৯৮৯)। ব্রিটিশ ভারতে রাষ্ট্রীয় বননীতি ও সামাজিক সংঘাত। পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট, ১২৩(১), পৃ. ১৪১–১৭৭।

২। গুহ, রামচন্দ্র। (১৯৮৩)। ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ-পরবর্তী ভারতে বনব্যবস্থা: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ। ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ১৮(৪৪), পৃ. ১৮৮২–১৮৯৬।

৩। ফার্নান্ডেজ, ওয়াল্টার। (২০০৭)। সিঙ্গুর ও উচ্ছেদের পরিস্থিতি। ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ৪২(৩), পৃ. ২০৩–২০৬।

৪। ফুকো, মিশেল। (১৯৮২)। বিষয় ও ক্ষমতা। ক্রিটিক্যাল ইনকোয়ারি, ৮(৪), পৃ. ৭৭৭–৭৯৫।

৫। সেথি, হরিশ। (১৯৮৮)। প্রযুক্তির মহান দৌড়। ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২৩(২০), পৃ. ৯৯৯–১০০২।

৬। শাবান, আব্বাস ও শর্মা, আর. এন। (২০০৭)। বড় শহরগুলোর গৃহস্থালিতে পানির ব্যবহার-প্যাটার্ন। ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ৪২(২৩), পৃ. ২১৯০–২১৯৭।

৭। চৌধুরী, এন. এস। (২০১২)। রাষ্ট্রের ছায়ায়: ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী রাজনীতি, পরিবেশবাদ ও বিদ্রোহ (গ্রন্থ পর্যালোচনা)। পলিটিক্যাল অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যানথ্রোপলজি রিভিউ, ৩৫(১), পৃ. ১৩৫–১৩৭।

৮। ওয়েলস, কে. এম। (১৯৮৫)। জাপানি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে কোরিয়ার অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (১৯২২–১৯৩২)। মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ, ১৯(৪), পৃ. ৮২৩–৮৫৯।

৯। কুমার, সঞ্জয়। (২০১৫)। ভারতে উন্নয়ন ও আদিবাসী উচ্ছেদ। ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ৫০(১২), পৃ. ৪৫–৫২।

১০। মহান্তি, বিষ্ণু। (২০১৪)। খনন শিল্প ও আদিবাসী ভূমি অধিকার। ইন্ডিয়ান জার্নাল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক, ৭৫(২), পৃ. ২১১–২২৮।

১১। দাস, অমিতাভ। (২০১৮)। বননীতি ও আদিবাসী জীবনের পরিবর্তন। জার্নাল অব ট্রাইবাল স্টাডিজ, ৬(১), পৃ. ৬০–৭৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। গুহ, রামচন্দ্র। (১৯৮৩)। ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ-পরবর্তী ভারতে বনব্যবস্থা: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ। দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

২। গুহ, রামচন্দ্র ও গাডগিল, মাধব। (১৯৯২)। ভারতের পরিবেশগত ইতিহাস: বিভক্ত ভূমির কাহিনি। দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

৩। ফুকো, মিশেল। (১৯৭৭)। শৃঙ্খলা ও শাস্তি: কারাগারের জন্ম। নিউইয়র্ক: ভিন্টেজ বুকস।

৪। ফুকো, মিশেল। (১৯৮০)। ক্ষমতা ও জ্ঞান: নির্বাচিত সাক্ষাৎকার ও রচনা। নিউইয়র্ক: প্যানথিয়ন বুকস।

৫। গুহ, রণজিৎ। (১৯৮৩)। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষক বিদ্রোহের মৌলিক দিকসমূহ। দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

৬। এলউইন, ভেরিয়ার। (১৯৬৪)। ভেরিয়ার এলউইনের আদিবাসী জগত। দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

৭। মজুমদার, ডি. এন। (২০০৭)। ভারতের উপজাতি সমাজ ও সংস্কৃতি। দিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।

৮। বিদ্যার্থী, এল. পি। (১৯৯১)। ভারতের আদিবাসী সংস্কৃতি। দিল্লি: কনসেপ্ট পাবলিশিং।

৯। রায় বর্মন, বি. কে। (২০১০)। ভারতে আদিবাসী উন্নয়ন। নয়াদিল্লি: সেজ পাবলিকেশন।

১০। সেন, অমর্ত্য। (১৯৯৯)। স্বাধীনতা হিসেবে উন্নয়ন। অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

১১। স্কট, জেমস সি। (১৯৯৮)। রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সমাজ: রাষ্ট্র ও উন্নয়নের বিশ্লেষণ। নিউ হ্যাভেন: ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস।